৯

ইন্টারনেট
Internet

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর মাধ্যম। বর্তমানে কম্পিউটার তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে সারা দেশের মানুষের মধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি বর্তমানে উদ্ভাবন আর অর্থনীতির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় বিবেচ্য এক বিষয়। তথ্য-প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য হারে শুধু উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলেনি, পাশাপাশি তা মানবসমাজের সামনে সুযোগ করে দিয়েছে উন্নত জীবনযাপন ও সহজতর উপায়ে কর্মসম্পাদনের। তথ্য-প্রযুক্তি উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল অথবা তৃতীয় বিশ্বের যেকোনো দেশেই ব্যবসায়ে, শিক্ষায়, বিশ্ব পর্যায়ে মিথস্ক্রিয় যোগাযোগ ইত্যাদিতে এনেছে এক নয়া দিগন্ত, এক নয়া বিপ্লব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এগিয়ে চলার পথের একটি বড় নিয়ামক হলো ইন্টারনেটব্যবস্থা। ইন্টারনেট তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এটি কোনো দেশ বিশেষের বা অঞ্চল বিশেষের নিজস্ব ব্যবস্থা নয়। এটি একটি বিশ্বব্যবস্থা, অন্য কথায় গ্লোবাল সিস্টেম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১ : ইন্টারনেটের ধারণা ও মৌলিক সেবাসমূহ
পাঠ- ৯.২ : ইন্টারনেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও ব্রাউজারের ব্যবহার

পাঠ ৯.১ ইন্টারনেটের ধারণা ও মৌলিক সেবাসমূহ
Concept of Internet and Basic Services

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ইন্টারনেটের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- ইন্টারনেটের সার্ভিসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ইন্টারনেট
Internet

ইন্টারনেট কথার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। অর্থাৎ ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্ক। বিশ্বের বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করলে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তাকে ইন্টারনেট বলে। এটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

চিত্র ৯.১.১ : একটি সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবস্থা

প্রথম দিকে ইন্টারনেটের নাম ছিল ARPANET। ১৯৬৮ সালের ARPANET ছিল ইন্টারনেটের প্রাথমিক পর্যায়। এ প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয় আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। তবে চারটি কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ARPANET-এর মাধ্যমে। প্রথম যে চারটি কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় সে কম্পিউটারগুলো লস এঞ্জেলেস, মেনলোপার্ক, সান্তা বারবার (U.C. Santa Barbara) এবং ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয় (The University of Utah)-তে অবস্থিত ছিল। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের জন্য TCP/IP উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের প্রাথমিক যাত্রা শুরু। ১৯৯২ সালে ইন্টারনেট সোসাইটি (ISOC) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ব্যবহারকারীকে কোনো সার্ভারের সাথে কম্পিউটার সংযোগ গ্রহণ করে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। এজন্য অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলো হার্ডওয়্যার প্রয়োজন। হার্ডওয়্যারগুলো হলো– কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোন লাইন ইত্যাদি । অনেক সময় প্রিন্টার এবং স্ক্যানারের প্রয়োজন হতে পারে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য হার্ডওয়্যারসামগ্রীর পাশাপাশি সফটওয়্যারের গুরুত্ব অপরিসীম। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য সিস্টেম

সফটওয়্যার হিসেবে Microsoft Windows NT, XP ইত্যাদি। কেবলমাত্র ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার হচ্ছে gmail, আউটলুক এক্সপ্রেস, ইউডোরা প্রো ইত্যাদি। Web pages ব্রাউজ করার সফটওয়্যার হচ্ছে Internet Explorer, Netscape, Google Chrome, Firefox ইত্যাদি। এছাড়া FTP, Ghoper, Telnet ইত্যাদি সফটওয়্যারও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে?
How Internet Works?

১. ইন্টারনেটের সকল কম্পিউটার কমান্ড এবং ডাটা আদান-প্রদানের TCP/IP প্রোটোকল ব্যবহার করে।

২. ইন্টারনেটে যেকোনো কম্পিউটার আরেকটি কম্পিউটারে সাথে সহজেই সংযোজিত হতে পারে।

৩. একটি কম্পিউটার প্রথমে লোকাল বা স্থানীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযোজিত হয়, অতঃপর ইন্টারনেট ব্যাকবোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

৪. একটি কম্পিউটার সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে সংযোজিত হতে পারে, অথবা আরেকটি কম্পিউটারের রিমোট টার্মিনালের সাথে অথবা নেটওয়ার্কের গেটওয়ের মাধ্যমে, যা কোনো TCP/IP ব্যবহার করে।

৫. ইন্টারনেটের সকল কম্পিউটারেরই একটি IP অ্যাড্রেস থাকে এবং প্রায় সকলের একটি ঠিকানা থাকে, যা ডোমেইন নেম সিস্টেম ব্যবহার করে।

৬. বেশির ভাগ ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামই ক্লায়েন্ট-সার্ভার মডেম ব্যবহার করে; ব্যবহারকারী ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম রান করে, যা সার্ভারের কাছ থেকে ডাটা এবং সেবা গ্রহণ করে।

ইন্টারনেটের সার্ভিসসমূহ
Internet Services

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের এগিয়ে চলার একটি বড় নিয়ামক হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেট আসলে বিশ্বের কম্পিউটারসমূহের মধ্যস্থিত একটি নেটওয়ার্ক মাত্র। ইন্টারনেটের বদৌলতে আজকে সমগ্র বিশ্বের সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারী একই বলয়ে আবদ্ধ হতে পারছেন। ফলে তথ্য ও যোগাযোগব্যবস্থার আশাতীত উন্নয়ন ঘটছে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন সার্ভিস বা সেবার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানের তথ্য গ্রহণ ও প্রদান করতে পারছি। ইন্টারনেটের প্রধান প্রধান সার্ভিস হলো–

- ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web)
- টেলনেট (Telnet)
- সার্চ ইঞ্জিন (Search Engines)
- ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল (File Transfer Protocol -FTP)
- ইলেকট্রনিকস মেইল (Electronic Mail :E-mail)
- ই-কমার্স (E-Commerce)
- ইন্টারনেট রিলে চ্যার্ট (Internet Relay Chat)

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব
World Wide Web

World Wide Web বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সংক্ষিপ্ত রূপ WWW। একে ওয়েবও বলে। ওয়েব এমন একটি বৃহৎ সিস্টেম, যা অনেকগুলো ওয়েব সার্ভারের মধ্যকার সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। এই ওয়েব সার্ভারগুলোতে সারা বিশ্বের ওয়েব পেইজগুলো সংরক্ষিত থাকে। মূলত সারা বিশ্বের ওয়েব পেইজগুলোর সংগ্রহই হলো ওয়েব। সার্ভারগুলো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে তথ্য (টেক্সট, ছবি, শব্দ ইত্যাদি) সরবরাহ করতে পারে। এসব তথ্য পাবার জন্য ব্যবহারকারীকে বিশেষ

ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয় যাকে বলে ওয়েব ব্রাউজার। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ওয়েব ব্রাউজার হলো ইন্টারনেট এক্সপ্লোয়ার, মজিলা ফায়ারফক্স, নেটস্কেপ নেভিগেটর ইত্যাদি।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে ECRN (The European Center for Nuclear Research)-এ। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে MOSAIC নামক গ্রাফিক্যাল ওয়েব ব্রাউজার আবিষ্কারের এক বছর পর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের বহুল প্রচলন শুরু হয়।

টেলনেট

Telnet

টেলনেট হচ্ছে এমন একটি ইন্টারনেট টুলস, যার সাহায্যে একটি কম্পিউটারের মধ্যে অন্য একটি কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় বা প্রবেশ করা যায়। এটি এমন একটি প্রোগ্রাম, যা একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটার ও দূরবর্তী কম্পিউটারের মধ্যে একটি জানালা হিসেবে কাজ করে। ফলে ব্যবহারকারীর কাছে মনে সে দূরবর্তী কম্পিউটারটির কাছে বসে কাজ করছে।

টেলনেট সংযোগ অনেক কাজের জন্য বেশ প্রয়োজনীয়। যেমন– একটি লাইব্রেরির ক্যাটালগের সাথে টেলনেট সংযোগ স্থাপন করে ঘরে বসেই এই লাইব্রেরি থেকে যেকোনো বই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। আবার টেলনেট সংযোগ স্থাপন করে অনলাইন কনফারেন্সও করা যায়।

সার্চ ইঞ্জিন

Search Engine

সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এক ধরনের ওয়েবসাইট বা টুলস, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভার থেকে যেকোনো তথ্য অথবা অন্যান্য ওয়েবসাইট খুঁজে পেতে সাহায্য করে। সার্চ ইঞ্জিনের ঠিকানা ব্রাউজার সফটওয়্যারের অ্যাড্রেস বারে লিখে এন্টার চাপ দিলে বা go তে ক্লিক করলে এই সার্চ ইঞ্জিনের ওয়েব পেজটি ওপেন হবে। সার্চ ইঞ্জিনের ফাইন্ড বক্সে কাঙ্ক্ষিত তথ্য বা ওয়েবসাইটের নাম লিখে এন্টার দিলে সে সম্পর্কিত বিভিন্ন ওয়েব পেজের লিংকের তালিকা প্রদর্শিত হবে। এর মধ্য থেকে উপযুক্ত সাইটটির ওপর ক্লিক করে ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে। সারা বিশ্ব অসংখ্য সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে। তার মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি সার্চ ইঞ্জিনের নাম ও তাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব নিচে দেওয়া হলো-

সার্চ ইঞ্জিনের নাম	বিশেষত্ব বা কাজ
গুগল (google)	সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো গুগল সার্চ ইঞ্জিন, যার সাহায্যে সহজেই যেকোনো ওয়েবসাইট বা তথ্য সার্চ করা যায়।
ইয়াহু (yahoo)	ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যেও সহজেই যে কোনো ওয়েব সাইট সার্চ করা যায়।
বিং (bing)	এটি মাইক্রোসফট কোম্পানির একটি সার্চ ইঞ্জিন, যার সাহায্যে খুব সহজেই ভিডিওসহ অন্যান্য সাইট সার্চ করা যায়।
পিপীলিকা (pipilica)	বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন হলো পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিন, যার সাহায্যে বাংলা লিখে সার্চ করা যায়।

ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল

File Transfer Protocol

FTP-এর পুরো নাম File Transfer Protocol। FTP এমন একটি সার্ভিস, যা ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ফাইল কপি করা যায়। এটি টিসিপি/আইপি প্রোটোকল সুট ফ্যামিলির অন্যতম সদস্য। ফাইল কপি করার জন্য এফটিপি ব্যবহার করা হবে যখন দুটো কম্পিউটারেই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকবে। লোকাল কম্পিউটার থেকে কোনো ডেটা বা ফাইল রিমোট কম্পিউটারে কপি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় আপলোডিং এবং রিমোট কম্পিউটার থেকে কোনো ফাইল বা ডেটা লোকাল কম্পিউটারে কপি করাকে বলা হয় ডাউন লোডিং।

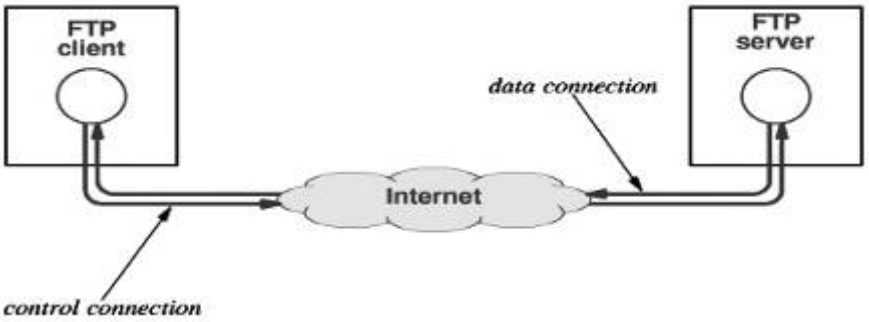

চিত্র ৯.১.২: একটি সাধারণ FTP সিস্টেম

ই-মেইল

E-mail

E-mail-এর পুরো নাম হলো Electronic Mail। ই-মেইল হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি। অর্থাৎ ইলেকট্রনিক উপায়ে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে ডিজিটাল মেসেজ বা বার্তা আদান-প্রদান করাকে ই-মেইল বলা হয়। ই-মেইল প্রেরণের জন্য সাধারণত একটি কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোন লাইন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কিছু সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসনকে ই-মেইলের জনক বলা হয়।

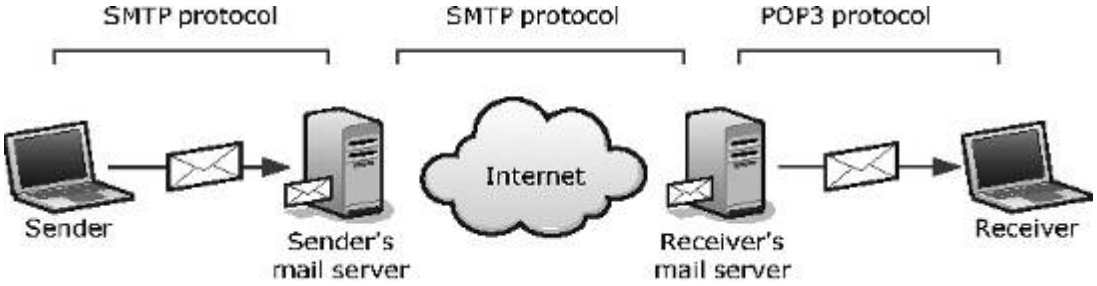

চিত্র ৯.১.৩ : একটি সাধারণ ই-মেইল সিস্টেম

ই-মেইল করার পর বা প্রেরণের পর প্রাপক যোগাযোগে উপস্থিত না থাকলে মেইলটি প্রাপকের চৌম্বক ডিস্কে জমা থাকে। প্রতিটি ই-মেইল ব্যবহারকারীর একটি ই-মেইল ঠিকানা বা অ্যাড্রেস থাকে। একটি ই-মেইল অ্যাড্রেসে দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশটি হলো user identity আর দ্বিতীয় অংশটি হলো domain name. যেমন- dulal03@gmail.com. এখানে dulal03 হলো user identity আর gmail.com হলো domain name.

ই-মেইল সুবিধা-প্রাপ্তির জন্য অথবা ই-মেইল আদান-প্রদানের জন্য যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– Microsoft explorer, Netscape, Eudoro, Mozilla Firefox, Google Chrome, Outlook Express ইত্যাদি। অবশ্য ফ্রি ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি করার জন্য¨ gmail.com, yahoo.com, hotmail.com প্রভৃতি ডোমেইন ব্যবহার করা যায়।

ই-মেইল পাঠানোর নিয়ম

সাধারণত তিনটি ধাপের মাধ্যমে একটি ই-মেইল পাঠানো যায়। ধাপগুলো হলো–

১. ই-মেইলটি কম্পোজ করা
২. ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন
৩. ই-মেইল সেন্ড করা

ই-মেইলটি কম্পোজ করা

কোনো ই-মেইল কম্পোজ করতে হলে প্রথমে ই-মেইলের জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যারটি ওপেন করতে হবে। এরপর Message মেন্যু থেকে New Message বা New Message To বা অন্য কোনো সফটওয়্যারের জন্য To mail আইকনে ক্লিক করতে হবে। তাহলে মেইল কম্পোজ করার জন্য একটি উইন্ডো ওপেন হবে, যেখানে নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকবে।

To :
From :
CC :
BCC :
Subject :
Attatch :

এর নিচে একটি খালি অংশ থাকবে, যেখানে মূল মেসেজ টাইপ করতে হবে। মেসেজটি কম্পোজ শেষ হলে সেভ করে বা কিউ করে আউট বক্সে নিয়ে রাখতে হবে। এভাবে একসাথে অনেকগুলো ই-মেইল কম্পোজ করে রাখা যায়।

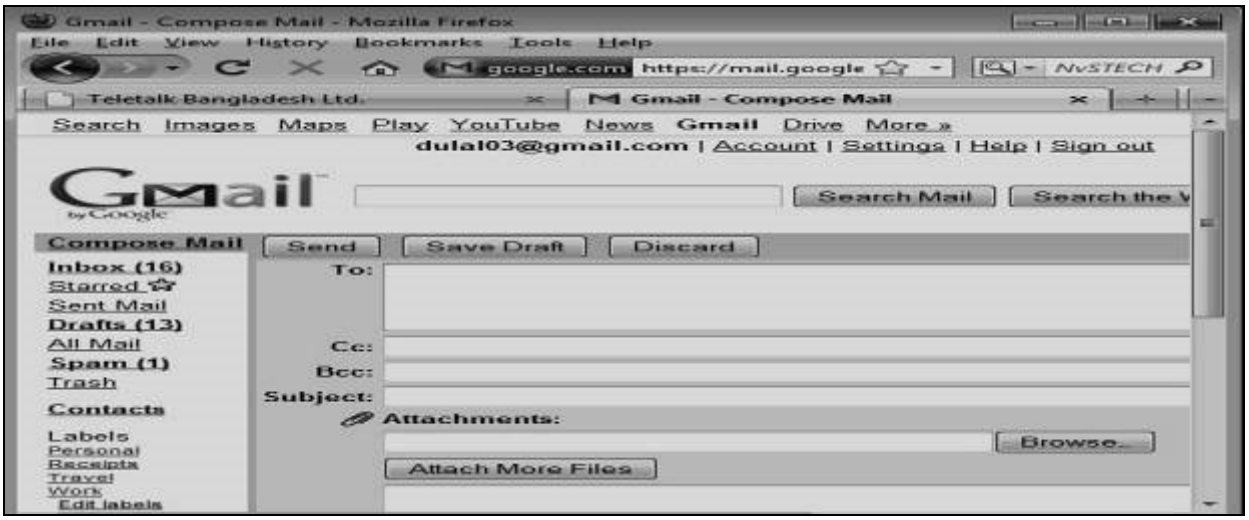

চিত্র ৯.১.৪: ই-মেইল কম্পোজ উইন্ডো

ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন : মেইল কম্পোজ করা শেষ হলে যদি ইন্টারনেট সংযোগ অবস্থা না থাকে তাহলে ইন্টারনেট সংযোগ নিতে হবে। এজন্য ডায়াল আপ নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো সংযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ই-মেইল সেন্ড করা : কম্পোজ উইন্ডোর Send অপশনে বা বাটনে ক্লিক করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসেজটি সেন্ড হবে এবং Send Message লেখাটি দেখাবে।

ই-মেইল কম্পোজ উইন্ডোর বিভিন্ন অংশ

To : এখানে যার কাছে ই-মেইল পাঠানো হবে তার ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হয়। তবে একই মেইল একাধিক ঠিকানা পাঠাতে হলে প্রতিটি ঠিকানা কমা (,) দিয়ে আলাদা করে লিখতে হবে।

From : এখানে প্রেরকের ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে। তবে কনফিগারেশনের সময় যে ঠিকানাটি দেওয়া হবে সেটিই আসবে।

CC : কার্বন কপি। একই মেসেজ বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে পাঠাতে চাইলে এখানে তাদের ঠিকানা কমা দিয়ে আলাদা আলাদা করে টাইপ করতে হবে। তাহলে গ্রাহক তার মেইলটি গ্রহণ করার পর এখানে প্রদর্শিত ঠিকানাসমূহ দেখে জানতে পারবে একই মেইল আর কার কার কাছে পাঠানো হয়েছে।

BCC : ব্লাইন্ড কার্বন কপি। একই মেসেজ বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে পাঠাতে চাইলে এখানে তাদের ঠিকানা কমা দিয়ে আলাদা আলাদা করে টাইপ করতে হবে। এর মতো প্রাপকের নিকট এখানে ঠিকানাসমূহ প্রদর্শিত হবে না ফলে প্রাপক জানতে পারবে না একই মেইল আর কার কার কাছে পাঠানো হয়েছে।

Subject : ই-মেইলের বিষয়। গ্রাহক যাতে সহজেই বুঝতে পারে সেজন্য ই-মেইলের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় এখানে লেখা হয়।

Attatch : সাধারণভাবে ই-মেইল করে নরমাল টেক্সট পাঠানো যায়। কিন্তু ই-মেইলের এটাচ কমান্ড ব্যবহার করে অন্য কোনো প্রোগ্রামে করা ফাইলকে ই-মেইলের সাথে অ্যাটাচ করে পাঠানো যায়।

ই-কমার্স

E-Commerce

ই-কমার্স একটি আধুনিক ব্যবসায় পদ্ধতি। E-Commerce-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Electronic Commerce। বর্তমানে ব্যবসায়িক জগতে ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্স ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান যুগের ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য, সেবা ও তথ্য ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা বিনিময় কার্যকেই ই-কমার্স বলে। অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নিজেদের সাথে বা একে অপরের সাথে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে ই-কমার্স বলা হয়। ইন্টারনেট ব্রাউজ করে ক্রেতাগণ ঘরে বসেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মান, মূল্য ইত্যাদি জানতে পারছে। আবার বিক্রেতাগণও তাদের পণ্যের বিপিণন সারা বিশ্ব জুড়ে করতে পারছে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হচ্ছে।

ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of E-Commerce

বর্তমানে বিশ্বকে অনলাইন বাজারে পরিণত করার প্রক্রিয়া অনেক আগেই চালু হয়েছে, যার দরুন ভৌগোলিক গণ্ডি পেরিয়ে খুব সহজে আন্তর্জাতিক বাজারে এখন অনলাইন বাজারের রূপ নিয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম আরো সহজ ও দ্রুত করে চলেছে। ই-কমার্সের প্রভাবে বর্তমান বিশ্ব এখন আর একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করে বহুগুণ। তবে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণেই দিন দিন ই-কমার্সের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১। ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ফলাফল যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই ভোগ করতে পারে।

২। ই-কমার্স পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র সর্বজনীন।

৩। ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করার জন্য কোনো আইনগত জটিলতা নেই।

৪। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, সঠিক মূল্য এবং সময়ের সাথে মানানসই।

৫। মূলত ই-কমার্স ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৬। ই-কমার্সে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তার খরচ অনেক কম। ফলে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ই-কমার্সের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে।

৭। ই-কমার্স বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনাতেও জটিলতা অনেকাংশে কমায়। যেমন– দ্রব্য ও সেবা বিক্রয়, ভাড়া ও সরবরাহসংক্রান্ত ব্যবসায় ই-কমার্স বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি করছে।

৮। ই-কমার্সের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব।

ই-কমার্সের সুবিধা
Advantages of E-Commerce

১. ব্যবসার মান বিশেষভাবে উন্নয়ন করা যায়।
২. ই-কমার্সের সাহায্যে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে করানো যায়।
৩. তথ্যের বিনিময় ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা যায়।
৪. ব্যবসায়িক কার্যক্রমের খরচ ব্যাপকভাবে কমায়।
৫. ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সহজে সুসম্পর্ক তৈরি করে।
৬. তথ্যের নির্ভুলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
৭. দ্রুত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছায়।
৮. পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন করা যায় ইত্যাদি।

ই-কমার্সের অসুবিধা
Disadvantages of E-Commerce

১। যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিলে পুরো প্রক্রিয়ার ওপর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
২। বিক্রয় প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ওয়েব সার্ভার ব্যবহার করে থাকে, যা সব সময় পাওয়া যায় না।
৩। আর্থিক লেনেদেনে নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
৪। ই-কমার্স পরিচালনায় দক্ষ লোকের অভাব দেখা যায়।
৫। ক্রেতা বা বিক্রেতা অনেক সময় ই-কমার্সের কার্যক্রমের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না।
৬। পণ্যের মানের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করা হয় না ইত্যাদি।

ই-কমার্সের প্রকারভেদ
Types of E-Commerce

বস্তুত ই-কমার্স হচ্ছে ডিজিটাল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং সঞ্চারণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়সংক্রান্ত আদান-প্রদান। সাধারণত এ কাজটি সম্পাদন করা হয় উন্মুক্ত একশটি নেটওয়ার্কব্যবস্থা তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। অর্থাৎ ই-কমার্সের মাধ্যমে ইন্টারনেট, এক্সট্রানেট এবং ইন্ট্রানেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসায়, ভোক্তা এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মধ্যে সংযোগ সাধন করা হয়। সেবা ও পণ্য লেনদেনের ভিত্তিতে ই-কমার্সকে সাধারণত চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়। যথা -

১। ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business : B2B)
২। ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer : B2C)
৩। ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business : C2B) ও
৪। ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer : C2C)

উপরের শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও নন-বিজনেস নামে একটি ই-কমার্স দেখা যায়।

ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business - B2B**) :** ব্যবসা থেকে ব্যবসাসংক্রান্ত ই-কমার্স একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাইকারি কেনাবেচাকে বিজনেস টু বিজনেস (B2B) বলা হয়। এ ধরনের ই-কমার্স সিস্টেমে পক্ষগুলোর মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সরবরাহকারী কিংবা পণ্য উৎপাদনকারী হতে পারে। B2B ই-কমার্সে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সহজে এবং দ্রুতগতিতে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে থাকে। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিনিয়তই B2B এর পরিরিধি বাড়ছে। তাই বর্তমানে অধিকাংশ ই-কমার্স আইওএস (IOS: Inter Organizational Information

System) এবং ইলেকট্রনিক মার্কেটের লেনদেনসমূহ বিজনেস টু বিজনেস (B2B)-এর আওতার মধ্যে পড়ে। উদাহরণ : alibaba.com।

ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer -B2C) : এক বা একাধিক ক্রেতা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্য খুচরা বা পাইকারি লেনদেনসমূহ বিজনেস টু কনজিউমার (B2C)-এর অন্তর্গত। ইন্টারনেটে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিজনেস টু কনজিউমার (B2C) সংক্রান্ত ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ব্যবসা থেকে ভোক্তা ই-কমার্স সিস্টেমে কোনো ভোক্তা সরাসরি কোনো ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারী থেকে পণ্য ক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ ভোক্তাগণ ই-কমার্স সিস্টেমে কোনো পণ্য ক্রয় করলে তা এ জাতীয় লেনদেনের আওতায় পড়ে। তবে এ ধরনের ই-কমার্সের মাধ্যমে ভোক্তার নিকট পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়কে অবশ্যই ইলেকট্রনিকস বাজারব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে। উদাহরণ : amazon.com।

ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business-C2B) : কিছু কিছু ব্যবসা আছে যা সরাসরি ভোক্তা শ্রেণির কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করে। এ জাতীয় লেনদেন ভোক্তা থেকে ব্যবসায় ই-কমার্সের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ যখন কোনো ভোক্তা এককভাবে অন্য কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লেনদেন করে তখন তাকে ভোক্তা থেকে ব্যবসা বা কনজিউমার টু বিজনেস বলা হয়। উদাহরণ : monster.com ।

ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer) : এ জাতীয় ব্যবসায়ে কোনো ব্যবহারকারী থেকে অন্য কোনো ব্যবহারকারীর মধ্যে লেনদেন সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ অন্য কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছাড়াই ভোক্তা থেকে ভোক্তার লেনদেনকে ভোক্তা থেকে ভোক্তা বা কনজিউমার টু কনজিউমার (C2C) বলা হয়। এ জাতীয় ব্যবসায়ে কোনো বিজনেস মিডলম্যান থাকে না। যেমন– এক শ্রেণির গাড়ি ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান আছে যারা পুরাতন গাড়ি কেনাবেচা করে। অর্থাৎ যদি প্রতিষ্ঠানটি একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে তাতে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পুরাতন গাড়ি ক্রয় করা একটি ব্যবস্থা রাখে এবং ক্রয় করে পুনরায় বিক্রয় করেন তাহলে এ ধরনের ই-কমার্সকে কনজিউমার টু কনজিউমার বলা হয়। উদাহরণ : ebay.com।

নন-বিজনেস ই-কমার্স (Non-Business E-Commerce) : বর্তমানে অনেক অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যেমন–শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি এজেন্সিসমূহ ব্যয় কমানোর জন্য এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ই-কমার্স ব্যবহার করছে। এ সকল লেনদেনের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য না থাকায় নন-বিজনেস ই-কমার্স বলা হয়।

বাংলাদেশে জনপ্রিয় ই-কর্মাস সাইটসমূহ হলো–

i. নতুন-পুরাতন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় : www.bikroy.com/ www.cellbazar.com
ii. অনলাইনে বই ক্রয়ের জন্য : www.boimela.com/ www.rokomary.com
iii. পণ্যের মূল্য ছাড় পাওয়ার জন্য : www.akhoni.com/ www. ajkerdeal.com
iv. প্রিয়জনকে বই উপহার পাঠানোর জন্য : www. gifthaat.com/ www.dishigociting.com

ইন্টারনেট রিলে চ্যার্ট
Internet Relay Chat-IRC

ইন্টারনেট রিলে চ্যার্ট হচ্ছে রিয়েল টাইমে, অর্থাৎ প্রকৃত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম বা পদ্ধতি। রিয়েল টাইম যোগাযোগ বলতে বোঝায় ঘটমান বর্তমানে অন্য ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ। ই-মেইলের মতো চ্যাটে অপেক্ষা করতে হয় না। ই-মেইলের ক্ষেত্রে ম্যসেজ পাঠানো এবং সেই ম্যসেজটি অন্য কেউ পাওয়া এবং তার উত্তর দেওয়ার মধ্যে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। IRC কে প্রায়ই ইন্টারনেটের 'CB রেডিও' হিসেবে অ্যাখায়িত করা হয়। কারণ এটা কয়েকজন বা অনেককে কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

IRC একটি মাল্টি-ইউজার সিস্টেম, যেখানে চ্যানেলে অংশগ্রহণ করে প্রকাশ্য বা গোপনে কথা বলতে পারে, চ্যানেল হচ্ছে একটি আলোচনার গ্রুপ, যেখানে চ্যাট ব্যবহারকারীরা কোনো বিষয়ে আলোচনা বা অংশগ্রহণ আহ্বান করতে পারে। এ ধরনের সিস্টেমে একজন ব্যবহারকারী ম্যসেজ টাইপ করে IRC চ্যানেলে পাঠিয়ে দেয়, ফলে চ্যানেলে অংশগ্রহণকারীরা ঐ ম্যসেজটি পড়তে বা উত্তর দিতে বা এগিয়ে যেতে পারে অথবা তাদের নিজেদের ম্যসেজ লিখতে পারে। অন্যদিকে চ্যাটরুম ওয়েবসাইটের আরেকটি জনপ্রিয় সংযোজন। ব্যবহারকারীরা বিশেষ কোনো চ্যাট সফটওয়্যার ইনস্টল না করে বা না চালিয়ে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সরাসরি কোনো চ্যাট সেশনে অংশগ্রহন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ :

কম্পিউটার জগতে ইন্টারনেট হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপ্লব। ইন্টারনেট হলো অসংখ্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক। অর্থাৎ ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্ক। বিশ্বের বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করলে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তাকে ইন্টারনেট বলে। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। আবার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য হার্ডওয়্যারসামগ্রীর পাশাপাশি সফটওয়্যারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইন্টারনেটের প্রধান প্রধান সার্ভিস হলো, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, টেলনেট, সার্চ ইঞ্জিন, ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল, ইলেকট্রনিকস মেইল, ই-কমাস, ইন্টারনেট রিলে চ্যার্ট ইত্যাদি। বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগব্যবস্থার কিছুটা উন্নয়ন ঘটলেও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত মান এখনো দিতে পারছে না। অর্থাৎ এখনো বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার পর্যাপ্ত হয়নি। যা ই-কমার্সের জন্য বড় ধরনের অন্তরায়।

পাঠ-৯.২ ইন্টারনেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও ব্রাউজারের ব্যবহার
Uses of the Internet, World Wide Web and Browser

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ইন্টারনেটের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও ব্রাউজারের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা
Advantages of uses Internet

প্রতিনিয়তই ইন্টারনেটের আওতায় কম্পিউটারের সংখ্যা বেড়ে চলছে, বেড়ে চলছে ইন্টারনেটের গুরুত্ব এবং ব্যবহার। শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা বিশ্বকে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণায় ধাবিত করছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হচ্ছে একটি কম্পিউটারনির্ভর নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, তাই কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবহার। নিম্নে ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

তথ্যের আদান-প্রদান : তথ্যপ্রবাহের এক অবাধ বিরামহীন বিশাল উৎস হচ্ছে ইন্টারনেট। বর্তমানে ইন্টারনেট তথ্যের আদান-প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ইন্টারনেট টেলিফোন, ফ্যাক্সের বিকল্প নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

তথ্য আহরণ : পৃথিবীর যেকোনো বিষয়ের ওপর চলতি তথ্যাবলি বর্তমানে ইন্টারনেটে ধারণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কোনো বিষয়ের ওপর তথ্যাবলি আহরণ করতে চাইলে সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তা নেওয়া যায়।

ই-মেইল : ই-মেইল আবিষ্কারের পর যোগাযোগব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে তা আর কোনোটিতে হয়নি। ইলেকট্রনিক উপায়ে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে ডিজিটাল মেসেজ বা বার্তা আদান-প্রদান করাকে ই-মেইল বলা হয়। এ ধরনের পদ্ধতির সাহায্যে যেকোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেকোনো তথ্য অন্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে পাঠাতে পারে। ই-মেইলের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের প্রাপকের কাছে ই-মেইল পাঠানো যায়।

ভিডিও কনফারেন্সিং : ভিডিও কনফারেন্সিং হলো এক ধরনের টেলিকনফারেন্সিং, যেখানে ছবি দেখা যায় এবং কথা বলা যায়। যার ফলে অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে কথোপকথন করতে পারেন। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্সিং করা যাচ্ছে। আবার বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ইমো বা মেসেঞ্জার। এই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো টেলিমেডিসিন সার্ভিস, যেখানে ডাক্তার ও বিভিন্ন জায়গার রোগী পরস্পরের সম্মুখীন হতে পারেন। এতে করে ডাক্তারদের জন্য চিকিৎসাপদ্ধতি সহজ হয় এবং রোগীরা উন্নত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া অপারেশনের মতো জটিল কাজেও ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সফটওয়্যার : সফটওয়্যার মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হার্ডওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ইন্টারনেট বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি সফটওয়্যার সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইন্টারনেট থেকে বিনা খরচে অজস্র ইউটিলিটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করা যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে : আজকাল ইন্টারনেট জ্ঞান অর্জনের মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। জীবনের যেকোনো প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তথ্য ইন্টারনেট থেকে আহরণ করে জ্ঞানার্জন করা যায়। অনলাইনে যে কোনো লাইব্রেরী থেকে কিংবা অনলাইনে অবস্থিত যেকোনো পুস্তক অধ্যয়ন করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়ে যেকোনো প্রয়োজনীয় কোর্স করা যায়।

অনলাইন মিডিয়া : আজকাল পত্রপত্রিকা কাগজে প্রকাশনার পাশাপাশি অন-লাইনেও প্রকাশ করা হয়। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সহজেই বিশ্বের খবরাখবর পেয়ে থাকে। তাছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল দেখারও সুযোগ রয়েছে।

বিনোদন : বিনোদনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। আজকাল অনেকেই অনলাইনে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে বিনোদন গ্রহণ করে থাকেন। আর বিভিন্ন রকম ইন্টারনেট মাধ্যম থেকে বিনোদনের স্বাদ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

বাণিজ্যিক : ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইন্টারনেট একদিকে যেমন ব্যবসায়িক যোগাযোগ বা করসপন্ডেন্সের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে পণ্যের বিপণন ও বিজ্ঞাপনের জন্য ওয়েব পেজ বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়া নিত্যনতুন উদ্ভাবন এবং যুগের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে দিন দিন ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। কম্পিউটারের ব্যবহারের বহুমুখিতা যত বৃদ্ধি পাবে, ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধাও তত বৃদ্ধি পাবে।

ইন্টারনেটের সংযোগ পদ্ধতি
Connection System of Internet

বর্তমানে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে। বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলো হলো–

১. ডায়াল আপ সিস্টেম (Dial-Up System)
২. আইএসডিএন (ISDN)
৩. ব্রডব্যান্ড (Broadband)
৪. ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)
৫. ওয়াইম্যাক্স (WiMax)

ডায়াল আপ সিস্টেম
Dial-Up System

এ ধরনের পদ্ধতিতে কম্পিউটারের সাথে টেলিফোন লাইন ও মডেম সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটার মডেমের মাধ্যমে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আইএসপি (ISP) বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। তবে ডায়াল আপ পদ্ধতিটি তুলনামূলক সহজ কিন্তু ইন্টারনেটের স্পিড তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

আইএসডিএন
ISDN

ISDN-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Integrated Service Digital Network. এটি নিয়মিত টেলিফোনের বিকল্প এক ধরনের টেলিফোন সার্ভিস। ISDN-এর সুবিধা হচ্ছে এটি নিয়মিত টেলিফোন লাইনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি দ্রুত ডেটা ট্রান্সমিশন বা আদান-প্রদান করতে পারে। তবে এটি সাধারণ টেলিফোন লাইনের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল। বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করেতে হয়, সেখানে এ ধরনের সার্ভিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্রডব্যান্ড
Broadband

এ ধরনের সার্ভিস সিস্টেম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রদান করে থাকে। ব্রডব্যান্ড সিস্টেমে ডেটা ট্রান্সমিশন বা আদান-প্রদানের হার অনেক বেশি। তবে তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

ওয়াই-ফাই
Wi-Fi

Wi-Fi-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wireless Fidelity। Wi-Fi-এর অপর নাম হচ্ছে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট এক্সেস। অর্থাৎ Wi-Fi হলো তারবিহীন এক ধরনের প্রযুক্তি, যা রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তিই-বিশ্ব পর্যায়ে মানুষকে জোগাচ্ছে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস সার্ভিস। তবে Wi-Fi এ ২.৪ গিগাহার্টজ (GH_z) ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়।

Wi-Fi-এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.11b (Institute of Electrical and Electronics Engineers)। তবে IEEE 802.11 হচ্ছে একটি ওয়্যারলেস বা তারবিহীন LAN স্ট্যান্ডার্ড। একটি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে দশটি বা তার অধিক কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করতে পারে। সাধারণত সকল নোটবুক, ল্যাপটপ, পেরিফেরাল ডিভাইস, প্রিন্টার, স্মার্ট ফোন, এমপি থ্রি প্লেয়ার, ভিডিও গেইম কনসোল এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার Wi-Fi-এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা যায়। ডাচ কম্পিউটার বিজ্ঞানী ভিক্টর ভিক হেরেসকে ওয়াই-ফাই-এর জনক বলা হয়। তিনি ডেল্ফট ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির সিনিয়র ফেলো হিসেবে কর্মরত অবস্থায় IEEE 802.11b ওয়াই-ফাই আবিষ্কার করেন। তবে অন্য স্ট্যান্ডার্ডসমূহ হলো 802.11a, 802.11g I 802.11n এবং যাদের গতি যথাক্রমে 54 Mbps, 54 Mbps I 300 Mbps. বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে IEEE 802.11n স্ট্যান্ডার্ডটি। আর IEEE 802.11a স্ট্যান্ডার্ডটি অধিক ব্যয়বহুল হওয়ায় বর্তমানে এর Public access নেই।

চিত্র ৯.২.১ : Wi-Fi ডিভাইস

চিত্র ৯.২.২ : একটি সাধারণ ওয়াই-ফাই সংযোগ সিস্টেম

১৯৯১ সালে নেদারল্যান্ডসের NCR Corporation আবিষ্কৃত এক ধরনের তারবিহীন নেটওয়ার্ককে আজকের Wi-Fi টেকনোলজির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)-এর কভারেজ এরিয়া একটি কক্ষ, একটি ভবন কিংবা কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে হয়ে থাকে। সাধারণত ইনডোরের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব 32 মিটার এবং আউটডোরের ক্ষেত্রে 95 মিটারের মত হয়ে থাকে। তবে আউটডোরের ক্ষেত্রে একাধিক অ্যাকসেস পয়েন্ট ব্যবহার করে এই কভারেজ আরো বৃদ্ধি করা যায়। অবশ্য Wi-Fi-এর ডেটা ট্রান্সফার রেট সাধারণত 11 Mbps থেকে 300 Mbps পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ওয়াই-ফাইয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এটি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক।
- সাধারণত নেটওয়ার্কের জন্য কোনো প্রকার ক্যাবল বা তারের প্রয়োজন হয় না।
- কভারেজ এরিয়া সাধারণত 50 মিটার থেকে 200 মিটারের মতো হয়ে থাকে।
- নেটওয়ার্কে সহজে নতুন নোড যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।

- হাফ ডুপ্লেক্সিং মোড ব্যবহৃত হয়।
- এটি সাধারণত 2.4 GHz–5GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। তবে বর্তমানে তা 5.85 GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- সিগন্যাল নয়েজ (SNR-signal to noise ratio) সর্বোচ্চ 10 dB (decibel)।
- বাধামুক্ত সিগন্যাল ট্রান্সফারের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন সুবিধা আছে।
- মিডিয়া অ্যাকসেস কন্ট্রোলের জন্য CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Cllision Avoidance) প্রোটোকল ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি।

ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধাসমূহ

১. ওয়াই-ফাইয়ের কনফিগারে খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
২. আইপি টিভি সেবা প্রদান করে।
৩. যেকোনো মানের Wi-Fi বিশ্বের যেকোন জায়গায় কাজ করে।
৪. দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও অধিক নিরাপদব্যবস্থা।
৫. শতাধিক ব্যবহারকারী একক বেজ স্টেশন ব্যবহার করতে পারে।
৬. সহজে নতুন ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারে।
৭. একাধিক অ্যাকসেস পয়েন্টের জন্য নেটওয়ার্ক রোমিং সুবিধা।
৮. ওয়াই-ফাইয়ের পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে কম।
৯. একই সাথে মাল্টিফাংশনালি সুবিধা পাওয়া যায়।
১০. বর্তমানের Wi-Fi স্ট্যান্ডার্ডগুলো ফ্রিকোয়েন্সি হোপিং সুবিধা প্রদান করে ইত্যাদি।

ওয়াই-ফাইয়ের অসুবিধাসমূহ

১. ওয়াই-ফাইয়ের সীমানা নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।
২. দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।
৩. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৪. বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৫. ডেটার আদান-প্রদানে নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে।
৬. নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে।
৭. তুলনামূলক কম নির্ভরযোগ্য।
৮. নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ব্যান্ডউইথ কমে যায়।
৯. ঝড়-বৃষ্টিতে সিগন্যালের সমস্যা দেখা দেয়।

ওয়াইম্যাক্স

WiMAX

WiMAX-এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Interoperability for Microwave Access. বহনযোগ্য কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার সুবিধাকে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি বলে। এটি একটি তারবিহীন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রযুক্তি। এটি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক। ২০০১ সালের এপ্রিলে ওয়াইম্যাক্সের জন্ম হয়।

বিভিন্ন প্রকার ইন্টারনেট সেবার মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে সীমিত আয়তনের এলাকায় ওয়াইম্যাক্স একটি সহজ ও সুবিধাজনক প্রযুক্তি। এটি ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (ম্যান)-এর মতো এবং এর গতি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মতোই গতিসম্পন্ন অথচ ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম। তবে ব্রডব্যান্ড ওয়াইম্যাক্স পদ্ধতির দুটি প্রধান অংশ থাকে। যথা–

১। বেজ স্টেশন : ইনডোর ও আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। বেজ স্টেশনগুলো একটি ওয়াইম্যাক্স হাব বা সুইচের সাথে যুক্ত থেকে নেটওয়ার্ক তৈরি করে এবং ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়।

২। ওয়াইম্যাক্স রিসিভার : এর সঙ্গে একটি অ্যান্টেনা থাকে এবং এটিই কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে। এর কভারেজ এরিয়া 10 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ওয়াইম্যাক্স সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–
১. ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স ও
২. মোবাইল ওয়াইম্যাক্স

ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স : ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স IEEE 802.16d স্ট্যান্ডার্ডের এবং এর ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 10 GHz থেকে 66 GHz। এ ধরনের সংযোগের জন্য গ্রাহক প্রান্তে একটি রিসিভার টাওয়ার বা অ্যান্টেনা বসানো থাকে এবং ওয়াইম্যাক্সের ব্যান্ডইউডথ মোবাইল ওয়াইম্যাক্সের তুলনায় বেশি থাকার পরও মোবালিটি না থাকার কারণে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

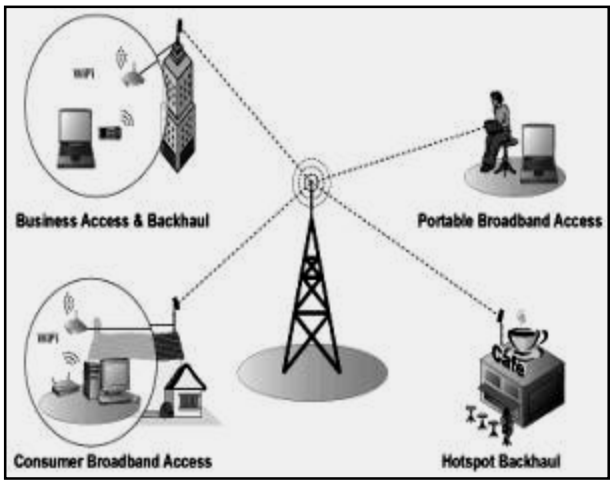

চিত্র ৯.২.৩ : একটি সাধারণ WiMAX সংযোগ ব্যবস্থা

মোবাইল ওয়াইম্যাক্স : মোবাইল ওয়াইম্যাক্স IEEE 802.16e স্ট্যান্ডার্ডের এবং এর ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 2 GHz থেকে 11 GHz। এ ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রান্তে মূলত এজ মডেম ব্যবহৃত এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ট্রান্সমিশনের কারণে সিগন্যাল যেকোনো জায়গায়, অর্থাৎ বাসার ভেতরে বা বাইরে অনায়াসে চলাচল করতে পারে। তবে এ ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে ওয়াইমাক্সের বেজ স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থান করতে হয়। অন্যথায় রেডিও সিগন্যাল লস বা ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মোবাইল ওয়াইম্যাক্স সার্ভিসের ক্ষেত্রে সার্ভিস প্রোভাইডারদেরকে অধিকসংখ্যক বেজ স্টেশন স্থাপন করতে হয়।

ওয়াইম্যাক্সের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এটি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক।
- কভারেজ এরিয়া সাধারণত 10 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- সাধারণত নেটওয়ার্কের জন্য কোনো প্রকার ক্যাবল বা তারের প্রয়োজন হয় না।
- নেটওয়ার্কে সহজে নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- ডেটা ট্রান্সফারের রেট সাধারণত 80 Mbps থেকে 1 Gbps পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- ফুল ডুপ্লেক্সিং মোড ব্যবহৃত হয়।
- এটি সাধারণত 2 GHz–66 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। তবে Non Line of Sight-এর জন্য ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 2 GHz থেকে 11 GHz এবং Line of Sight-এর জন্য ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 2 GHz থেকে 66 GHz ।
- সিগন্যাল নয়েজ (SNR-signal to noise ratio) সর্বোচ্চ 7 dB (decibel)।
- বাধামুক্ত সিগন্যাল ট্রান্সফারের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন সুবিধা আছে।
- ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড লাইসেন্স বা লাইসেন্সবিহীন হতে পারে।
- ওয়াইম্যাক্স কানেকশন ওরিয়েন্টেড MAC প্রোটোকল ব্যবহার করে ইত্যাদি।

ওয়াইম্যাক্সের সুবিধা

১. অধিক নিরাপদ ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা।
২. তারের নেটওয়ার্কে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তা মেরামতের প্রয়োজন হয় কিন্তু ওয়াইম্যাক্সে সে ঝামেলা নেই।

৩. যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রেও এখানে বিনিয়োগ এককালীন। সেদিক দিয়ে খরচ অনেক কম।
৪. এর যোগাযোগের আওতা অনেক বেশি হওয়ায় (১০ থেকে ৬০ কিলোমিটার) পথে-ঘাটে যেকোনো জায়গা থেকেই উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব।
৫. ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল বা ভিওআটি ব্যবহার করে যোগাযোগ হয় আরো সহজে।
৬. শতাধিক ব্যবহারকারী একক বেজ স্টেশন ব্যবহার করতে পারে।
৭. কোয়ালিটি অব সার্ভিসের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
৮. একই সাথে মাল্টিফাংশনালি সুবিধা পাওয়া যায়।

ওয়াইম্যাক্সের অসুবিধা

১. অধিক ব্যয়বহুল।
২. দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।
৩. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৪. ঝড়-বৃষ্টিতে সিগন্যালের সমস্যা দেখা দেয়।
৫. বিদ্যুৎ খরচ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশি।
৬. নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ব্যান্ডউইথ কমে যায়।
৭. অন্যান্য ডিভাইস কর্তৃক সিগন্যাল জ্যামের সৃষ্টি হয়।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের কার্যপ্রণালী

Working System of World Wide Web

World Wide Web বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সংক্ষিপ্ত রূপ WWW। একে ওয়েবও বলে। ওয়েব হলো এমন একটি বৃহৎ সিস্টেম, যা অনেকগুলো ওয়েব সার্ভারের মধ্যকার সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। ওয়েব ক্লায়েন্ট-সার্ভার আর্কিটেকচার অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। এর অর্থ হচ্ছে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি বা ওয়েবটি রান করে অনুরোধ (Request) পাঠাবে সার্ভারে। সার্ভার, ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের অনুরোধকৃত তথ্যটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের ব্রাউজারের কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং ব্রাউজার তা অনুবাদ করে স্ক্রিনে প্রদর্শন করবে। আর এভাবেই ওয়েব ব্রাউজার তার কার্যক্রম সম্পাদিত করে।

ওয়েব ব্রাউজার

Web Browser

ওয়েব ব্রাউজার হলো এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ইন্টারনেট হতে তথ্য পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীকে বিশেষ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয় তাকে ব্রাউজার বলে। অর্থাৎ সার্ভারগুলো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে তথ্য (টেক্সট, ছবি, শব্দ ইত্যাদি) সরবরাহ করতে পারে। এসব তথ্য পাবার জন্য ব্যবহারকারীকে বিশেষ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয় যাকে বলে ওয়েব ব্রাউজার।

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ওয়েব ব্রাউজার হলো–

- ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (Internet Explorer)
- মজিলা ফায়ারফক্স (Mozilla Fire Fox)
- সাফারি (Safari)
- অপেরা (Opera)
- গুগল ক্রম (Google Chrome)
- নেটস্কেপ নেভিগেটর ইত্যাদি।

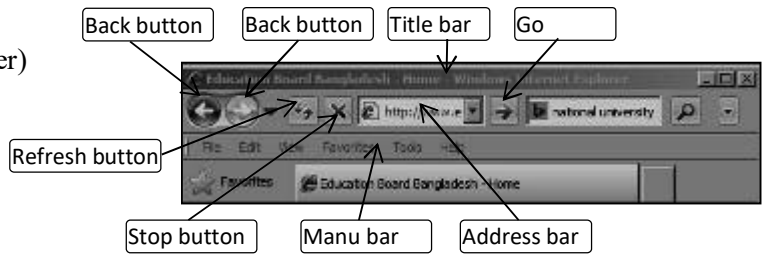

অবশ্য ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট প্রদর্শন করাকেই ওয়েব ব্রাউজিং বলা হয়। ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য যেকোনো ব্রাউজার চালু করে অ্যাড্রেস বারে যেকোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানা লিখে Go বাটন বা কি-বোর্ডের এন্টার কি চাপলেই কিছুক্ষণের মধ্যে উক্ত ওয়েবসাইটটি প্রদর্শিত হবে। এভাবে সাধারণত ওয়েব ব্রাউজিং করা হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

প্রতিনিয়তই ইন্টারনেটের আওতায় কম্পিউটারের সংখ্যা বেড়ে চলছে, বেড়ে চলছে ইন্টারনেটের গুরুত্ব এবং ব্যবহার। শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করার পূর্বে ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন হয়। ডায়াল-আপ, ব্রডব্যান্ড, ওয়াই-ফাই, ওয়াইমাক্স ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো অনেকগুলো মাধ্যমের একটি মাধ্যম যার সাথে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের তথ্য প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন ওয়েব ব্রাউজার। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মজিলা ফায়ারফক্স, সাফারি, অপেরা, গুগুল ক্রম ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের ওয়েব ব্রাউজার।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. ইন্টারনেট কী? ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্পর্কে লিখুন।
২. 'আজকাল ঘরে বসে কেনাকাটা অধিকতর সুবিধাজনক'–ব্যাখ্যা করুন।
৩. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বিস্তারিত বর্ণনা দিন।
৪. সার্চ ইঞ্জিন কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৫. ই-কমার্স কী? ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
৬. ই-কমার্সের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৭. ই-মেইল ও ই-মেইলের অ্যাড্রেস বলতে কী বোঝায়?
৮. ওয়াইম্যাক্স কী? ওয়াইম্যাক্সের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৯. ওয়াইম্যাক্সের সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।
১০. ওয়াই-ফাই কী? ওয়াই-ফাইয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
১১. ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।
১২. ওয়াই-ফাই ও ওয়াইম্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
১৩. ব্রাউজার কী? কয়েকটি ব্রাউজারের নাম লিখুন।
১৪. ই-কমার্সকে আধুনিক ব্যবসার পদ্ধতি বলা হয় কেন? বর্ণনা করুন।
১৫. ই-কমার্স পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কে কীভাবে সহজ করেছে? ব্যাখ্যা করুন।
১৬. টেলনেট কী? ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ ও সুবিধাগুলো আলোচনা করুন।
১৭. ই-মেইল কী? ই-মেইল পাঠানোর নিয়ম বর্ণনা করুন।
১৮. ই-মেইল কম্পোজ উইন্ডোর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করুন।
১৯. ইন্টারনেট রিলে চ্যাট সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২০. ই-কমার্সের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
২১. ডায়াল আপ, আইএসডিএন ও ব্রডব্যান্ড সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Sinha P K, Computer Fundamentals
- E Balagurusamy, Fundamentals of Computers
- Sarah E. Hutchinson, Computers and Information Systems
- Norton, Introduction to Computers
- C S Frence, Computer Science
- Warford, Computer Science